Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফ : জীবন কথা

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.13
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.13
Pages	179-202
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহমদ শরীফ : জীবন কথা

আহমদ কবির*

প্রাজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের যে মহিমা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুই মহাপণ্ডিতকে ঘিরে থাকত তা আমরা অনুভব করি ডক্টর আহমদ শরীফের মধ্যেও। তিনি বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁর মৃত্যুতে বড় মাপের পণ্ডিত ও গবেষকদের জমানা প্রায় শেষ হল বলে মনে করি। বাংলাদেশের জ্ঞান বিদ্যার জগতে তিনি এক বিরাট মহীরুহ, এক অনন্যসাধারণ শিক্ষক ও অনুপম ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ডক্টর শরীফের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রধান এলাকা হলেও তিনি ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি মানববিদ্যার বিচিত্র শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ছিলেন অনুসন্ধিৎসু এবং এসব বিষয়ে তিনি লিখেছেন একাধিক আলোচনা-সমালোচনা ও প্রবন্ধ এবং সেগুলোর কোনো কোনোটি গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ, কোনো কোনোটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণঋদ্ধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই। যোগ্য সম্পাদনা করে ধূসর বিবর্ণপ্রায় বাংলা পুথিগুলোকে জীবন্ত রূপ দান এবং সেগুলোকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ত করা তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। তবে শুধু ইতিহাসের অতীতে নয়, প্রতিদিনের চলমান জীবন সম্বন্ধেও ডক্টর শরীফ ছিলেন দারুণ কৌতূহলী। তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন মানুষের হালচাল, জীবনযাত্রা, আর্থিক অবস্থা, রাজনীতির ছবি, সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা, এবং এমন আরো কত প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ এবং এ-সব সম্বন্ধে লিখতেন তাঁর ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিংবা হালকা চালের প্রবন্ধে। বলাবাহুল্য, আমাদের চিন্তার জগতে ডক্টর আহমদ শরীফের বেশ বড় প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের তিনিও এক সেনাপতি। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কেন্দ্রীয় প্রণোদনা মানবমঙ্গল। সেজন্য সামাজিক অন্যায়, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর কলম সবসময় শাণিত, সবসময় তীক্ষ্ণমুখ এবং বেজায় সাহসী। যুক্তিহীন, পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল, অন্ধ প্রথাবদ্ধ ধ্যানধারণার তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, মানুষের দুই পা, দুই হাত, দুই চোখ সামনের দিকে, সুতরাং অগ্রযাত্রাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক। প্রতিদিন সূর্যও একভাবে ওঠে না। পুরোনো নিয়ে থাকলে মানুষ এগুবে কী করে। মানুষ বিকাশশীল প্রাণী, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের পুরোনো ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের দুর্গ ভেঙে যাবে এবং এইভাবে মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে যাবে। ভূতে-ভগবানে ও শাস্ত্রে ডক্টর শরীফের সম্পূর্ণ অনাস্থা, আর যুক্তি দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁর পূর্ণ আস্থা। নাস্তিক্যদর্শন জগৎসংসারে

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নতুন কোনো প্রসঙ্গ নয়। তিনি এ দর্শনে স্বস্তি পেতেন এই জন্য যে তা সর্বমানবিক, অসাম্প্রদায়িক এবং সম্পূর্ণরূপে অসূয়ামুক্ত। মানুষের ঈশ্বরে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ধর্মের ঈশ্বরে তিনি প্রত্যয় পাননি। যতই দিন গিয়েছে, ততই যুক্তি ও বিজ্ঞান তাঁকে টেনেছে এবং তাঁর জ্ঞান বুদ্ধিকে পাকাপোক্ত করেছে। সন্দেহ নেই, ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁর মননঋদ্ধ রচনার মাধ্যমে আমাদের ভাবচিন্তার জগতে বিপুল আলোড়ন তুলেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অভিভাবকতুল্য চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তাঁর চরিত্রের অতুলন আদর্শ সব সময় অক্ষুণ্ন ছিল। সেইজন্য চরিত্রবান বুদ্ধিজীবী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন তিনি। লোভে ও লাভে হামলে পড়েননি কখনো তিনি, গণবিরোধী মনে করতেন বলে তিনি সরকারের কাছ থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা কিংবা পদ গ্রহণ করেননি। সরকারি বুদ্ধিজীবীর বশংবদতা, কর্তাভজনা ও সুবিধাবাদ তাঁর কাছে সবসময় আপত্তিকর ও ঘৃণার্হ ছিল। এইভাবে তিনি অনমনীয় রেখেছিলেন নিজের উন্নত শির এবং বজায় রেখেছিলেন বুদ্ধিজীবী নামের মানমর্যাদা। বাংলাদেশের বামধারার রাজনীতিবিদেরা যে তাঁর কাছে আসতেন তা এই জন্য নয় যে তিনি মন্ত্রপড়া সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রবল শ্রেয়োবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও গণমানবহিতৈষণা তাঁকে সমাজতন্ত্রীদের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি দীক্ষিত সমাজতন্ত্রী নন বটে, তবে সমাজতন্ত্রে অনুরাগী ও প্রত্যয়ী। সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্নও তিনি লালন করেছেন আমৃত্যু।

কোনো কোনো প্রাজ্ঞ লোক বলেন, ডক্টর শরীফ নিজেকে নির্মাণ করেছেন। কথাটি মেনে নিতে আপত্তি নেই। একথা তো মানতে হবে, অধ্যয়ন ও রচনাকর্মে বিপুল শ্রম দিয়েছেন ডক্টর শরীফ। মননবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকলে অধীত বিদ্যার আলো যে ঠিকরে পড়ে তা ডক্টর শরীফের লেখার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে বর্ণনা নয়, বিশ্লেষণ আর সমীকরণই ডক্টর শরীফের লেখার বৈশিষ্ট্য। সে জন্য তাঁর যে কোনো রচনা, তা সাহিত্যের ইতিহাস হোক বা সমকালীন দেশজ চালচিত্রই হোক, সবই বীক্ষামূলক ও চিন্তা উদ্রেককারী। পাঠক তাঁর যে-কোনো লেখার মধ্যে নতুন ভাবনার পরিচয় পাবেন, নতুন অভিমতের সন্ধান লাভ করবেন, আর পাবেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে তর্ক-প্রতর্কের সূত্রগুলো। প্রচুর লিখেছেন তিনি আমরণ, একেবারে নিরলসভাবে। সিরিয়াস লেখার অজস্র সম্ভার কেবল ডক্টর শরীফেরই রয়েছে এবং এসব কারণে বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তার জগতে তিনি স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন।

ডক্টর আহমদ শরীফ তিন কালের মানুষ। ব্রিটিশ আমলে তাঁর জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা এবং এই আমলেই তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। তাঁর কর্মজীবন সুব্যাপ্ত পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশ আমলে। তাঁর পেশা মূলত অধ্যাপনা, নেশা অধ্যয়ন, গবেষণা ও লেখালেখি। অন্যদিকে তাঁর নেশা নির্মল আড্ডাও। মধ্যজীবন থেকে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সভা-সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকেন তিনি এবং এই সম্পৃক্তি বাংলাদেশ আমলে নানা রাজনৈতিক সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার

মধ্য দিয়ে আরো সক্রিয় হয়। ফলে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সচেতন বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ভূমিকা মিলিয়ে ডক্টর শরীফ ক্রমশ হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের এক দারুণ আকর্ষণীয় আলোচিত মানুষ ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠান রূপে। একারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক, গবেষক, পণ্ডিত, লেখক, মনীষী, বুদ্ধিজীবী ডক্টর আহমদ শরীফের জীবনবৃত্তান্ত সকলের আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয় হওয়াই স্বাভাবিক।

জন্ম, শৈশব, ছাত্রজীবন

আহমদ শরীফ ১৯২১ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল নয়টা-দশটার মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা বছরের হিসেবে সেদিন ছিল পয়লা ফাল্গুন; নবীন যৌবন, বসন্ত ও ফুলবাসরের প্রথম দিন। আহমদ শরীফ যে সারাজীবন যৌবন, তারুণ্য ও প্রগতির সাধনা করেছেন তা তাঁর জন্মদিনই যেন সূচনা করে দিয়েছে। আহমদ শরীফের পিতার নাম আবদুল আজিজ (১৮৮০-১৯৪৬) এবং মায়ের নাম সিরাজ খাতুন (১৮৮৮-১৯৮৩)। পারিবারিক বংশলতিকা অনুযায়ী জনৈক হাবিলাশ মল্ল আহমদ শরীফের বংশের আদিপুরুষ। ইনি সুচক্রদণ্ডী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন না। পরবর্তীকালে কাদির রাজা নামে এই বংশের এক উত্তরপুরুষ সুচক্রদণ্ডীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। আহমদ শরীফ কাদির রাজার ষষ্ঠ প্রজন্মের বংশধর।

আহমদ শরীফের পিতামহ মুনশি আইনুদ্দিন (১৮৪০-১৯৩৭) চট্টগ্রাম জজকোর্টে নকলনবিস ছিলেন। আবদুল আজিজ আইনুদ্দিনের তৃতীয় সন্তান। তাঁর ভাইবোনেরা হলেন যথাক্রমে বদিউন্নেসা, আবদুল মজিদ, আবদুল গনি ও আবদুল সোবহান। আবদুল আজিজ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজিয়েট স্কুলের কেরানি ছিলেন। আহমদ শরীফ পিতামাতার চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র। তাঁর অন্য ভাইবোনেরা হলেন যথাক্রমে আহমদ কবীর (১৯০৮-১৯৭২), সাজেদ আরা বেগম, আহমদ সোবহান (১৯১৯-১৯৮৪), আহমদ জহীর (মৃত্যু ১৯৮৪), এবং চেমন আরা। আহমদ শরীফের বড় ভাই আহমদ কবীর চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে ছিলেন। মেজো ভাই আহমদ সোহবান ছিলেন বাংলাদেশ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের সুখ্যাত ব্যবহারজীবী।

সম্পর্কে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পুথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আহমদ শরীফের পিতৃব্য; তবে আরেক পিতামহ মুনশি নূরউদ্দিনের (১৮৩৮-১৮৭১) পুত্র। নূরউদ্দিন অল্প বয়সে মারা যান। তখন তাঁর পিতা মুহম্মদ নবী (১৮০১-১৮৯৯) সম্পত্তি রক্ষার্থে এগারো বছর বয়সী নাতি আবদুল করিমের সঙ্গে তাঁর মেজো ছেলে আইনুদ্দিনের নয় বছর বয়সী কন্যা অর্থাৎ তাঁরই নাতনী বদিউন্নিসার (১৮৭৬-১৯৫৩) বিয়ে দেন। সুতরাং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আহমদ শরীফের শুধু পিতৃব্য নন, আপন ফুফাও। আবদুল করিম বদিউন্নিসার একটি মাত্র কন্যা—আলতাফুননিসা (১৯০১-১৯৭৭), তাঁদের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। পুত্রহীন এই দম্পতি আহমদ শরীফকে আপন

ছেলের মতো গ্রহণ করেন এবং অত্যধিক স্নেহ ও আদরে বড় করতে থাকেন। বোঝা যায় একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আহমদ শরীফের জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল। এমনিতেই ব্রিটিশ আমলে পটিয়া ছিল শিক্ষাদীক্ষায় চট্টগ্রামের সবচেয়ে উন্নত এলাকা। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বহু কীর্তিমানের প্রসূ এই পটিয়া। আবদুল করিম ছিলেন উদারমনা, অসাম্প্রদায়িক, রুচিবান মানুষ। তাঁর অনসুন্ধিৎসা, সংগ্রহচিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, বক্তব্য, লেখালেখি—সবকিছুর মধ্যে এই মনোভাবেরই ছিল সুস্পষ্ট চিহ্ন। আর ছিল বাংলা ও বাঙালিয়ানার প্রতি সুগভীর প্রত্যয় ও মমত্ব। পিতৃতুল্য পিতৃব্যের স্নেহছায়ায় লালিত আহমদ শরীফের মধ্যে উত্তরকালে এইসব গুণের সবটাই বর্তেছিল।

আর সব মুসলমান ছেলের মতো আহমদ শরীফকেও শৈশবে আরবি পড়া, কুরআন পাঠ, নামাজ শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মীয় পাঠ ও কৃত্যাদি করতে হয়েছিল। তিনি স্থানীয় পটিয়া স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। তথাকথিত আহামরি ছাত্র তিনি কখনো ছিলেন না। নিতান্ত পুথিগত বিদ্যায়ও আবদ্ধ ছিলেন না তিনি কখনো। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে নানা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জেগেছিল। সেজন্য স্কুলে বিতর্কসভায় ও সাহিত্য-আলোচনায় তিনি সবসময় উৎসাহ পেতেন এবং সানন্দে অংশগ্রহণও করতেন। স্বভাবগত জেদ ও গোঁ কোনো বিষয়ে তাঁর প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার উৎসাহকে সবল করত। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাপ তখন গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অসামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা আহমদ শরীফের ছোটবেলাতেই ঘটেছিল। বিদেশি বেনিয়াদের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভের উত্তাল সময়ে আহমদ শরীফ স্কুল-কলেজের ছাত্র। আহমদ শরীফ ১৯৩৮ সনে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আইএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এ.এবং ১৯৪২ সনে ডিস্টিংশনবিহীন বি.এ. পাস করেন। উল্লেখ্য যে, আহমদ শরীফের ম্যাট্রিক, আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, কেবল এম.এ. পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৪৪ সনে তিনি বাংলা বিষয় নিয়ে এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গণেশচরণ বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, মোহিতলাল মজুমদার, কবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্যায়ের পরীক্ষার ফলে দুটো শ্রেণী ছিল, একটি ডিস্টিংশন (শতকরা পঞ্চাশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর), অন্যটি নন-ডিস্টিংশন (পঞ্চাশের নিচের নম্বর)। আহমদ শরীফ বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশন পাননি, পেয়েছিলেন নন-ডিস্টিংশন। এই নন-ডিস্টিংশনকে না জেনে না বুঝে তৃতীয় শ্রেণী বা রেফার্ড ধরে নিয়ে আহমদ শরীফের নিন্দক, দোষক ও শত্রুরা তাঁর শিক্ষাজীবনের অনুজ্জ্বলতার কথা বলে বেড়াতেন এবং এ রকম মন্দ ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, এমনকি তাঁর অতি সফল অধ্যাপনা জীবন সমাপ্ত হওয়ার পরেও। গভীর

গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী আহমদ শরীফ এ নিয়ে বিপুল কৌতুক অনুভব করেছেন সব সময়। অবশ্য আহমদ শরীফ প্রায়শ বলতেন তিনি কখনো তথাকথিত ভালো ছাত্র ছিলেন না। তবু আহমদ শরীফ দূষণে নিন্দকদের ক্লান্তি ছিল না। মনে হয় আহমদ শরীফের পরবর্তী জীবনের অর্জিত পর্বতপ্রমাণ বিদ্যাবত্তা, অসংখ্য গ্রন্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখে এরা এতই ঈর্ষালু ও কাতর ছিলেন যে সাধারণ মাত্রাজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। আহমদ শরীফ চলিষ্ণু মানুষ, একদিনে তিনি খ্যাতিমান হননি। প্রভূত অধ্যয়ন, পরিশ্রম, বোধের পরিমার্জনা ও উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা তাঁকে পৌঁছিয়েছে এমনই এক উঁচু অবস্থানে যেখানে ওঠা তাঁর নিন্দকদের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পাননি বলে যে তিনি মেধাশূন্য এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। মেধা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্রেরও প্রয়োজন। আহমদ শরীফ ছাত্রজীবনোত্তর কালে পড়াশোনার ব্যাপকতা দিয়ে নিজের প্রতিভা বিকশিত করেছিলেন। অনেকটা তাঁর শিক্ষক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো। শহীদুল্লাহর পরীক্ষার ফলও ডেকে বলবার মতো কিছু নয়, অথচ তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা স্মরণ করলে মাথা নোয়াতে হয়।

অধ্যাপনা জীবন

বিদ্যায়তনের পাঠ শেষ হওয়ার পর আহমদ শরীফ অনতিবিলম্বে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৪৫ সনের আগস্ট মাসে লাকসামের পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুননেসা কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এই কলেজে প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী আসহাবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং আসহাবউদ্দিনের মৃত্যু পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব অটুট থাকে। আসহাবউদ্দিন সাহেব পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টির একান্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত হন। ফয়জুননেসা কলেজে অল্পদিন চাকরি করার পর ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফেনী ডিগ্রি কলেজে যোগ দেন। ফেনী কলেজেও তিনি বেশি দিন থাকেননি। ১৯৪৯-এর জুন মাসে তিনি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট বা কর্মসূচি নিয়ামক রূপে যোগ দেন এবং এই পদে কাজ করেন ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। ততদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের একটা সুযোগও সৃষ্টি হয়ে যায়। আহমদ শরীফ ১৯৫০-এর ১৮ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ সূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত হিন্দু শিক্ষক ভারতে চলে যান, ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেককে নিয়োগও দেওয়া হয়। আহমদ শরীফের চাকরি অবশ্য সেরকম পদ পূরণের সুবাদে হয়নি, এ নিয়োগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এই নিযুক্তি নিয়ে আহমদ শরীফ পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে লিখেছেন,

> ...মোটামুটিভাবে ১৮৯৪ সন থেকে সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন পুথি সংগ্রহে, সংরক্ষণে, পরিচায়নে এবং সম্পাদনায় জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ব্যয় করেছেন। তাঁর সেই নিষ্ঠার, সাধনার প্রভাব পড়েছিল হয়তো আমার অবচেতন মনেই। তাই তিনি যখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আগ্রহে শেষ জীবনে তাঁর সমস্ত পুথির সম্ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করতে নয়, নিঃশর্তে দানই করতে চাইলেন—আমি তখন

পাকিস্তান রেডিও-র ঢাকা স্টেশনে কাজ করি। এবং আমার নিজের আগ্রহেই সাহিত্যবিশারদকে জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথি-পড়ুয়া কোন লোক নেই। কাজেই তাঁরা যদি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে শিক্ষক করে নেন, তাহলে পুথি পড়ার এবং চর্চার একজন লোক মিলবে। সে সময়ে (১৯৪৯-৫০) কোন পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা সরকারি অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। সেজন্য আমাকে তক্ষুণি লেকচারার না করে কিছু কালের জন্য রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট বা গবেষণা সহকারী রূপে নিযুক্ত করতে রাজি হলেন। আমিও সাহিত্যবিশারদের অসমাপ্ত কাজে সমাপ্তি দানের বিবেকী দায়িত্ববোধে এবং ভবিষ্যতে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগের আগ্রহে আর পদোন্নতির আশ্বাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫০-এ।

(প্রশ্নোত্তরে কিছু আত্মকথা—জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা)।

সাক্ষাৎকারের এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আহমদ শরীফের যোগদানের ক্ষেত্রে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যবিশারদ যে ছয়শ'র মতো পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন সেগুলো সংরক্ষণেরও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া আহমদ শরীফ পুথি ভালো করে পড়তে পারেন। সাহিত্যবিশারদের কাছে তিনি এ-বিদ্যা শিখেছেন। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথি পড়ানোর তিনিই তো যোগ্য লোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি দিয়ে অপাত্রে ঘি ঢালেননি। গবেষণা সহকারী থেকে লেকচারার হতে আহমদ শরীফের সময় লেগেছিল পুরো সাত বছর। পেন্ডুলামের মতো তিনি দুলতে থাকেন। একবার অস্থায়ী লেকচারার হন, আবার গবেষণা সহকারীতে ফিরে আসার কাণ্ড চলে। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার জন্য গবেষণা ও প্রকাশনার যে শর্ত ছিল সেগুলো ভালোভাবে পূরণ করলেও আহমদ শরীফ সহজে লেকচারার হতে পারেননি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোনো ফল হয়নি। তাঁর জন্য সাত বছরেও কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। দীর্ঘ বিলম্বের পর আহমদ শরীফ ১৯৫৭ সনের ১৭ অক্টোবর বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে নিয়োগ পান, কিন্তু তাও অস্থায়ীভাবে। স্থায়ী লেকচারার হন আরো প্রায় তিন বছর পরে, ১৯৬০-এর ৭ আগস্ট। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পদ ছিল তিনটি—লেকচারার, রীডার ও প্রফেসর। আহমদ শরীফ লেকচারার থেকে রীডার অর্থাৎ এখনকার দিনের এসোসিয়েট প্রফেসর হন ১৯৭০-এর ২৭ জুলাইয়ে, প্রায় তের বছর নিরবচ্ছিন্ন চাকরি করার পর। ততদিনে শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম হয়েছে, গবেষক ও লেখক হিসেবে তাঁর পুরো প্রতিষ্ঠাও হয়েছে, মধ্যযুগের কয়েকটি সম্পাদিত পুথি ও মৌলিক প্রবন্ধের সংকলনও বেরিয়ে গেছে, প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য গবেষণামূলক নিবন্ধ, আর *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিও পেয়ে গেছেন তিনি (১৯৬৭)। ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তি নিয়ে ডক্টর শরীফ সবসময় কৌতুক অনুভব করতেন। বলতেন, এ হচ্ছে বুড়ো বয়সে বিয়ে করার মতো—আনন্দও আছে, আবার লজ্জাও প্রচুর। সে যাই হোক, ডক্টর শরীফের যোগ্যতার কমতি তো ছিলই না, বরং বাড়তিই ছিল। সে সময় বাংলা বিভাগে একটি মাত্র

প্রফেসর (অধ্যাপক) পদ ছিল। তাতে সমাসীন ছিলেন বাংলা বিভাগের পিতৃতুল্য অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, দুই রীডারের পদে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। বিভাগে পদই বা কোথায়, আর নতুন পদ কখন হবে কে জানে! এখনকার মতো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন পদ সৃষ্টি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। একবার ভেবেছিলেন সদ্যস্থাপিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন, যেমন পরে চলে গিয়েছেন তাঁরই প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী সুখ্যাত গবেষক ও শিক্ষক ডক্টর আনিসুজ্জামান। এর মধ্যে সারা দেশে তুমুল সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভের তীব্রতায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আইউব খানের পতন ঘটল। নতুন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের আমলে সৃষ্ট নূর খান কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যত্র নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করলেন। কিন্তু ঐ সময়ে বাংলা বিভাগে ঘটে গেল এক বিপুল বিপর্যয়। বাংলা বিভাগের সুদীর্ঘকালের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেলেন (৩ জুন ১৯৬৯)। ঠিক চল্লিশ দিন পর মারা গেলেন মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফের শিক্ষক, সকলের শিক্ষাগুরু, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কিংবদন্তিতুল্য পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩ জুলাই ১৯৬৯)। বাংলা বিভাগের নতুন অধ্যক্ষ খ্যাতনামা নাট্যকার ও শিক্ষক মুনীর চৌধুরী তিনজন সিনিয়র শিক্ষকের কথা মনে রেখে বিভাগে নতুন তিনটি রীডারের পদ পূরণে সচেষ্ট হলেন। ফলে ডক্টর আহমদ শরীফ, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একই সঙ্গে রীডার হলেন (২৭ জুলাই ১৯৭০)। হাই সাহেবের মৃত্যুর ধকল কাটিয়ে মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বিভাগ আস্তে আস্তে সুস্থিত হচ্ছিল। আহমদ শরীফ ছিলেন মুনীর চৌধুরীর বয়োজ্যেষ্ঠ, আর সকল শিক্ষক ও ছাত্রের মতো তিনি আহমদ শরীফের গবেষণার সুখ্যাতি করতেন, তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে দেখতেন। মুনীর চৌধুরী বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা *সাহিত্য পত্রিকার* সম্পাদনার ভার ডক্টর শরীফের উপর ছেড়ে দিলেন। ঐ সময় ডক্টর শরীফের প্রিয় মানুষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরেক বড় পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, যিনি তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সহযোগে *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সুদীর্ঘ সরকারি চাকরি শেষে বাংলা বিভাগে সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর পদে যোগ দেন। মুনীর চৌধুরী আরেক প্রবীণ শিক্ষক মুহম্মদ ইদরিস আলীকেও বিভাগে পড়ানোর কাজে নিয়ে এলেন। বিভাগের মুরুব্বিশূন্যতায় অনেকটাই পূর্ণতা এল।

উনিশ শ উনসত্তর, সত্তর ও একাত্তরের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী ও তরুণ মহলে ডক্টর শরীফের তত্ত্বগত লেখালেখি ও বক্তৃতার বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনিই শহীদ মিনারে লেখকদের সংগ্রামী শপথবাক্য পাঠ করান। সে কারণে তিনি পাকিস্তান সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন এবং একাত্তরে পাকবাহিনীর চরম নিপীড়ন, অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস পরিত্যাগ করে ঢাকার আত্মীয় বাড়িগুলোতে গোপন এলাকায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলা বিভাগের কোনো শিক্ষক দেশত্যাগ করেননি। তবে অনেকে ঢাকাতে, ঢাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে পলাতক জীবনযাপন

করেছেন। অনেকে বিভাগে আসতেনও না, ঐ ভীতিকর প্রাণঘাতী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকভাবে চলতেই পারে না। পাকিস্তানের দালাল ছাড়া অন্য সকল শিক্ষক ঐ সময় স্বাভাবিকভাবে সন্ত্রস্তই ছিলেন। কিন্তু এই শঙ্কিত অবস্থায়ও অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। ডক্টর শরীফও তাই করেছিলেন। তাঁর নিরাপত্তা নিয়েও তাঁর অনুরাগীরা মহাচিন্তিত ছিলেন। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অবসানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেখা গেল পাকিস্তানের ঘাতক বাহিনী দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলেছে, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে এবং বাংলা বিভাগে চরম আঘাত হেনেছে। ডক্টর শরীফ প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু হারালেন তাঁর দীর্ঘদিনের প্রিয় সহকর্মীদের। ঘাতকেরা মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশাকে ধরে নিয়ে বধ করল। তখন দুঃখ ও বেদনার ভারে বাংলা বিভাগে গভীর শোকাবস্থা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে ভূষিত হয়ে বিভাগীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কয়েক জন নতুন শিক্ষকের নিয়োগও হল। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে বাংলা বিভাগের পঠনপাঠনে ও গবেষণা তত্ত্বাবধানে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক রূপে ডক্টর শরীফের উপর দায়িত্বও বর্তাল এবং সে দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করে চলছিলেন। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল শহীদ মুনীর চৌধুরীর শূন্য পদে (প্রফেসর পদ) কাকে নেওয়া হবে এই প্রশ্নে। গবেষক হিসেবে ডক্টর শরীফের নামডাক অনেক, সুতরাং তিনি যে এই পদের জন্য একজন শক্ত প্রার্থী তাতে সন্দেহ ছিল না; অন্যদিকে বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমও আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ডক্টর শরীফের ঠিক আগে। বিভাগের বাইরে আরো দুই-একজন শিক্ষক প্রফেসর পদের প্রার্থী ছিলেন। বাংলা বিভাগের এই প্রফেসর পদের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছিলেন। নির্বাচকমণ্ডলী ঘন ঘন মত বদলিয়েছিলেন। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল শিক্ষকরাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতির নোংরামি। এইসব নোংরামি ও চরিত্রহনন দেখে নির্বাচকমণ্ডলীর কেউ কেউ যাঁকে এই পদে যোগ্য মনে করেছিলেন সেই ডক্টর আনিসুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা, বিভাগের পূর্বতন শিক্ষক, তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত এবং বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষ্য তৈরিতে ব্যস্ত, পত্রিকায় এক বিবৃতি দান করেছিলেন এই মর্মে যে এতসব অরুচিকর কাণ্ডের পরে বাংলা বিভাগের প্রফেসর হওয়ার কোনো বাসনাই তাঁর নেই। কিন্তু ততক্ষণে চ্যান্সেলরের কল্যাণে বিভাগে একটি প্রফেসরের বদলে তিনটি পদ হয়ে গেছে। দুই পদে বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ও ডক্টর আহমদ শরীফের নিয়োগ হল। তৃতীয় পদ পূরণে বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ডক্টর আনিসুজ্জামান এলেন না।

ডক্টর আহমদ শরীফ ১৯৭২ সনের ৪ নভেম্বর তারিখে বাংলা বিভাগের প্রফেসর হন। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিসরে ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে ডক্টর শরীফের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান প্রসঙ্গে নতুন করে বলার কিছু নেই। বাংলাদেশের

স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কালাকানুনমুক্ত রাখার অবস্থা তৈরি করেছে এবং সেজন্য নতুন অধ্যাদেশের প্রয়োজনও দেখা দিল। ১৯৭৩-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রবর্তনে ডক্টর শরীফেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত হলেও তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ শিক্ষকদের দলাদলির পথ সুগম করে দেয়। সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ হিসেবে শিক্ষকদের মত-পথের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে; কিন্তু সে মত-পথ যদি আদর্শভিত্তিক না হয়ে লোভ-লাভ প্রাপ্তি ও সুবিধাবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে তা অনৈতিক এবং সেজন্য তা নিন্দনীয়। শিক্ষক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা যদি নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা আর সাহস হারায় তাহলে বুঝতে হবে দেশের সর্বনাশ হতে আর বেশি বাকি নেই। সরকারি ও সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের ডক্টর শরীফ বুদ্ধিজীবী না বলে বলতেন 'নগদজীবী'। এরকম নগদজীবী ও প্রশাসনের প্রসাদপুষ্ট শিক্ষক আকীর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ডক্টর আহমদ শরীফ মূর্তিমান প্রতিবাদ। তাঁকে ঘিরে নিয়মনিষ্ঠার অনুসারী ও স্বাধীনচেতা শিক্ষকদের একটি শক্তিশালী দল গড়ে ওঠে। তিনি এই পদের নেতৃপদে বৃত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যাপনা জীবনে ডক্টর আহমদ শরীফ বিড়ম্বিত ও অপমানিত বোধ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকশাল রাজনীতির তোড়জোড়ের সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আরো কেউ বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। বাকশালের সদস্য হওয়া এবং বাকশালের প্রচার-প্রসার কামনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এ-ক্ষেত্রে বিন্দুতম আপত্তিরও কোনো অবকাশ নেই। তবে বাকশালের ছাত্র ফ্রন্টের নেতা এসে বিভাগে বিভাগে, হলে হলে শিক্ষক ও ছাত্রদের সবক দিয়ে যাবেন তা রীতিমতো অপমানজনক। সে না হয় সওয়া গেল, কিন্তু চ্যান্সেলর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তারিখে বিশেষ আগমন উপলক্ষে বাকশালে শিক্ষকদের যোগদান নিয়ে যে জবরদস্তিমূলক অসহনীয় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা খুব আপত্তিকর। শেখ মুজিবুর রহমান নিশ্চয়ই বলে দেননি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবশ্যই ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট দুপুর ১২টার মধ্যে বাকশালের সদস্য হতে হবে এবং না হলে পরিণতি খুব খারাপ হবে। সে রকম তিনি বলতেই পারেন না, কিন্তু তাঁর নামে তাঁর অত্যুৎসাহী পারিষদেরা সে সময় অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছিল। সে বাড়াবাড়িতে শিক্ষক সমাজ দারুণ আহত হয়েছিল, হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলেনি। কিন্তু ডক্টর আহমদ শরীফ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, এ জবরদস্তি কেন এবং এরকম বাঁধাধরা সময়ই বা কেন? স্বভাবতই তিনি বাকশালের সদস্য হননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প কয়েকজন শিক্ষক বাকশালে স্বাক্ষর করেননি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, ভূতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর আবদুল লতিফ, বাংলা বিভাগের সনজীদা খাতুন ও আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং ইতিহাস বিভাগের আহমেদ কামাল প্রমুখ। সে সময় রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের বাকশালের সদস্য করার অভিযান চালানো

হয়েছিল এবং গোটা ব্যাপারটাকেই আনন্দকর করার পরিবর্তে করে তোলা হয়েছিল আতঙ্ককর। তখন জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও নূরে আলম সিদ্দিকী, সাংবাদিকদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান, বাংলা একাডেমীর অন্যতম পরিচালক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আবদুল হক আতঙ্ককর পরিস্থিতিতেও বাকশালের সদস্য হন নি। সেই ত্রাসের পরিস্থিতিতে এবং তার পরেও অনেক দিন দুঃসাহসী প্রতিবাদের জন্য ডক্টর আহমদ শরীফসহ এই ব্যক্তিদের নাম লোকমুখে আলোচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতিতে ডক্টর আহমদ শরীফ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দলের প্রার্থী হয়ে তিনি মোট চারবার কলা অনুষদের ডীন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন; প্রথম বার ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে একনাগাড়ে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩তে তাঁর অবসরকালীন সময় পর্যন্ত। বিভিন্ন সময়ে তিনি সিন্ডিকেট ও সিনেটের সদস্য ছিলেন। আর শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন ১৯৭৫-৭৬ বর্ষে। ১৯৭৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্যানেলের নির্বাচনে তিনি সফলতা পাননি, যেহেতু সিনেটে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের দল ভারী ছিল। ঐ সময় তাঁর নৈতিক সত্তাকে একটু আপসের দিকে নিয়ে গেলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনৈতিকতার পথে কখনো পা মাড়াননি। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যাহতি নিলে ডক্টর আহমদ শরীফ বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান হন (১৫ অক্টোবর) এবং ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সনের ৩০ জুন তিনি বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩২ বছর ৬ মাস ১৪ দিন চাকরিরত ছিলেন। চাকরিজীবনের নির্দিষ্ট কার্যকালের চেয়ে তিনি মাত্র এক বছর অতিরিক্ত চাকরি করতে পেরেছিলেন। ডক্টর শরীফ যখন অবসর নেন তখন দেশে সামরিক শাসন চলছে। বিভিন্ন সময়ে সভা-সমিতিতে সরকারবিরোধী বক্তব্য দানের জন্য এবং সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা করার জন্য সরকারের অনুগত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডক্টর শরীফকে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখার সাহস দেখায়নি, বরং তাঁকে সর্বতোভাবে বিদায় করার পাকাপাকি ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। ডক্টর শরীফের বিপক্ষীয় শিক্ষকেরা তো তাঁর বিরুদ্ধতা করবে, কিন্তু তাঁর স্বপক্ষীয় শিক্ষকেরাও তাঁর ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখাননি। শিক্ষকতা, ভাষণ, লেখালেখি ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি পাণ্ডিত্যের যে ভাবমূর্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকর এমিরিটাস প্রফেসর পদটি সর্বাগ্রে তাঁরই প্রাপ্য ছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেছে বেছে অনুগত কয়েকজনকে এমিরিটাস প্রফেসর করলেন, ডক্টর শরীফের কথা বিবেচনায়ও আনলেন না। ষাট বছর বয়সে নির্দিষ্ট চাকরিকাল অতিক্রম করলেও ডক্টর শরীফ দেহে ও মনে শিক্ষকতার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন এবং আরো বহুদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার ধারায় অবদান রাখতে পারতেন। ছাত্র ও গবেষকেরা তাঁর সাহচর্যে লাভবান হত। ডক্টর শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কম

তো দেননি; এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে তিনি নিশ্চয়ই সহায়তা দিয়েছেন। বড় পণ্ডিতের আবার অবসর কী! ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তো আমৃত্যুই লেখাপড়ার ও গবেষণার কোনো না কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ডক্টর আহমদ শরীফকেও তেমনি কোনো সম্মানজনক কাজে লাগানো যেত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকের চিত্তদীন সংকীর্ণতা তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত রাখার পরিপূর্ণ অন্তরায় ছিল। এতে ডক্টর শরীফের ক্ষতি হয়েছে তা তো নিশ্চয়ই বলা যাবে না, বরং ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিদ্যার্থীদের। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ অবশ্য ডক্টর শরীফের মূল্য বুঝেছিল, সেজন্য তাঁকে দুই বছরের জন্য নজরুল অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়েছিল (১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬)। এরই ফল তাঁর নজরুল বিষয়ক কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, যা পরবর্তীকালে *একালে নজরুল* গ্রন্থে রূপ নেয়।

ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন অতিমাত্রায় দায়িত্বশীল শিক্ষক। তিনি কখনো ক্লাস কামাই করেননি, ক্বচিৎ কখনো ছুটি নিয়েছেন, আর ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছেন শ্রেণীকক্ষে। প্রথানুগত ও একান্ত গ্রন্থকেন্দ্রিক বক্তৃতা তিনি কখনো দিতেন না। কোনো বিষয় পড়াতে গেলে তিনি মানববিদ্যা, সমাজবিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে ছড়িয়ে যেতেন। তাঁর বক্তৃতা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে ও উস্কে দিতে খুবই সহায়ক ছিল। উনিশ শতকের ডিরোজিয়ান ঘরানার শিক্ষক ছিলেন তিনি, সেজন্য জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানব্রতী ছাত্র কিংবা তরুণ পেলে তিনি প্রভূত আনন্দ পেতেন। অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয় শিক্ষক তিনি, তাঁর অধ্যাপনা জীবনও সুখের ও আনন্দের। অধ্যাপনা জীবনকে প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> অপরিমেয় অবসরঋদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষকতা আমাকে মধ্যযুগের কাব্য সম্পাদনার কঠিন শ্রম ও অধ্যবসায়সাধ্য কাজের সুযোগ দিয়েছে, দিয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা লিখিতভাবে প্রকাশের সুযোগ, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে জনসেবার, জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার সুযোগ ও সুবিধে। সর্বোপরি নিরুপদ্রব, নির্বিবোধ, নিরাপদ আনন্দিত জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতা জীবনে।

এইসব কথাতে বোঝা যায় যে ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁর অধ্যাপনা জীবনকে দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। আর এটিও উপলব্ধি করা যায় যে স্বাধীনভাবে লেখাপড়া ও গবেষণা করার এবং মত প্রকাশ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকতা শুধু ক্লাসকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা স্পর্শ করে দেশকে, দেশের মানুষকে।

সংসার জীবন

১৯৪৬ সনের ১১ জানুয়ারি গুরুতর টাইফয়েড রোগে আহমদ শরীফের পিতা আবদুল আজিজ মারা যান। তিনি ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারেননি। অবশ্য আহমদ শরীফের প্রকৃত অভিভাবক পিতৃতুল্য পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তখনো জীবিত আছেন। তিনি ১৯৪৭-এর ৭ নভেম্বর

অর্থাৎ পাকিস্তান হওয়ার কয়েক মাস পরে ফেনীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খান সাহেব শাহাবুদ্দিন মাহমুদের দ্বিতীয়া কন্যা সালেহা মাহমুদকে (জ. ১৯২৮) আহমদ শরীফের বউ করে আনেন। সালেহা মাহমুদ বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর মাহমুদ নুরুল হুদার ছোট বোন। শরীফ দম্পতির দাম্পত্য জীবন সুখের, শান্তির ও আনন্দের এবং তা পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় জুড়ে। ১৯৯৭-এর নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ এই দম্পতি নিজেদের বাড়িতে (২৫/বি ধানমণ্ডি, সড়ক ২, ঢাকা) পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন। এতে আহমদ শরীফের অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও অনুসারী অংশগ্রহণ করেছিল। স্ত্রী হিসেবে সালেহা শরীফ এককথায় অতুলনীয়া। পুরো সংসারের তিনিই তত্ত্বাবধায়ক। গবেষক ও পণ্ডিত আহমদ শরীফের সংসার-বুদ্ধি তেমন ছিল না। যাকে বলে বৈষয়িক তিনি সেরকমও কিছু নন। তিনি কখনো বাজার করেননি, চাল, ডাল, আলু, পটল, মাছ, বিস্কুট, ওষুধ চানাচুর কিছুই কেনেননি; অবশ্য এগুলো করার সময় তিনি পাননি, পড়াশোনা নিয়েই থেকেছেন সারা জীবন। বড় রুই মাছ কিনলে শখের রান্না করেছেন এক আধ সময়, মাংসে হলুদ বেশি হলে টের পেতেন, এ পর্যন্ত। এ সব সত্ত্বেও, শরীফ সাহেবের সংসারের যা কিছু সাংসারিক ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তার সবটা কৃতিত্ব সালেহা শরীফের। আহমদ শরীফ আড্ডাপ্রিয় প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিজীবী। তাঁর বাড়িতে নিত্য আত্মীয়স্বজন, অতিথি, অভ্যাগত, ছাত্র, গবেষক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, লিখিয়ে ও জিজ্ঞাসুরা আসত। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, সমিতি, সংঘ, সভা, বিবৃতি ইত্যাদি তাঁর বৈঠকখানাতেই হত। এতসব লোকের আদর আপ্যায়ন ও দেখাশোনা করার যাবতীয় দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে হাসিমুখে পালন করেছেন সালেহা শরীফ; ডক্টর শরীফকে একটুখানি বিব্রত হতেও দেননি। আহমদ শরীফের বাড়িতে এসে আপ্যায়িত না হয়ে গেছে এমন কাউকে দেখা যায়নি। মোট কথা, আহমদ শরীফকে তাঁর জ্ঞানচর্চার ও চিন্তার জগতে সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুদ্বিগ্ন রেখেছিলেন সালেহা শরীফ। আহমদ শরীফ ও সালেহা শরীফের তিন সন্তান, তাঁদের কন্যা সন্তান নেই। তাঁদের প্রথম পুত্র রেজভির (মাহমুদ করিম) জন্ম হয় ১৯৫০-এর আঠার মার্চ, শনিবার। রেজভি বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক এবং বর্তমানে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের নির্বাহী কর্মকর্তা। দ্বিতীয় পুত্র ফৈজির (নেহাল করিম) জন্ম হয় ১৯৫১-এর ২১ নভেম্বর, বুধবার। ডক্টর নেহাল বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। কনিষ্ঠ পুত্র স্বপনের (যাহেদ করিম) জন্ম ৯ মে ১৯৫৪, রবিবার। স্বপনও বিবাহিত এবং এখন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট। আহমদ শরীফ ও সালেহা শরীফের পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্ররা সবাই মিলে অটুট একান্নবর্তী পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ।

সময় যত যায়, বয়োজ্যেষ্ঠ স্বজন ও প্রিয়জনেরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। মানুষকে এসব সইতে হয়। আহমদ শরীফকেও সইতে হয়েছে তাঁর প্রিয় মানুষদের বিয়োগব্যথা। তাঁর কর্মজীবনের সূচনাস্তরে পিতা আবদুল আজিজের মৃত্যু হয়। যাঁর স্নেহে আদরে বড় হয়েছেন সেই মাতৃসমা ফুফু বদিউন্নিসাও পক্ষাঘাত রোগে মারা যান ১৯৫৩-এর পঁচিশে মার্চ। সম্ভবত স্ত্রী বিয়োগের কারণে

একাকিত্ব সইতে পারেননি আহমদ শরীফের সবচাইতে প্রিয় মানুষ তাঁর পিতৃসম অভিভাবক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৩ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আহমদ শরীফ সত্যিকারের অভিভাবকহারা হলেন। ১৯৭২ সনে তাঁর বড় ভাই আহমদ কবীরের মৃত্য হয়। তাঁর মা সিরাজ খাতুন দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন, মারা যান ১৯৮৩ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ৯৫ বছর বয়সে। মেজো ভাই আবদুস সোবহানও ১৯৮৪ সনের ২০ জুন আকস্মিকভাবে মারা যান। এই মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যে আহমদ শরীফের ছোট ভাই আহমদ জহীর ওরফে বশরেরও ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হয় ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪তে। ভাইদের মধ্যে একমাত্র আহমদ শরীফই আরো বছর পনের বেঁচে থাকেন। এই সময়প্রবাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সহকর্মীদের অনেকেই বিগত হন। তাঁর শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী ডক্টর এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েকবছর আগে। তাঁর দুই বয়োকনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক ও ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, যাঁরা ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহযাত্রী, তাঁর মৃত্যুর দুই-এক বছর আগে মারা যান। এঁরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল কীর্তিমান শিক্ষক। এঁদের নিয়েই ডক্টর আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানবিদ্যার সমুন্নত জগতে বিচরণ করতেন। দুঃখ এই যে, এঁরা আহমদ শরীফকে একলা রেখে আগেই চলে গিয়েছেন।

লেখা ও গবেষণা

আহমদ শরীফের অসংখ্য লেখা, অসংখ্য গবেষণা, অসংখ্য প্রবন্ধ, অসংখ্য গ্রন্থ। বাংলাদেশের গদ্য লেখকদের মধ্যে এত বেশি লেখা খুব কম লোকের আছে। ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখার জগতে প্রবেশ করেন। পারিবারিক পরিবেশ ছিল অনুকূল। পিতৃসম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে দেখেছেন পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করতে এবং পুথি বিষয়ে কিংবা সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে গুরুতর প্রবন্ধ লিখতে। সুচক্রদণ্ডীর বাড়িতে নিয়মিত আসত সে আমলের সাহিত্য পত্রিকা ও সাময়িকীগুলো। তাছাড়া বাড়িতে কবি-সাহিত্যিক ও উৎসাহী সংস্কৃতিসেবীদের আনাগোনা তো ছিলই। যে পারিবেশিক আবহে মানুষ হয়েছিলেন আহমদ শরীফ, তাতে তাঁর পক্ষে লেখার জগতে আসাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তিনি যখন পড়তেন তখন কখনো কখনো তিনি লিখেছেন। স্বভাবতই সেসব লেখা ছিল অপরিণত এবং এখন সেগুলো লুপ্ত। চট্টগ্রাম কলেজে যখন পড়তেন তখন কলেজ ম্যাগাজিনে (১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে) 'ভাষা বিভ্রাট' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এটিই আহমদ শরীফের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। পরে ঢাকার বৃহত্তর লেখার পরিবেশে এসে আহমদ শরীফও প্রায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়ার সময় *দৈনিক আজাদের* কোনো এক সংখায় (১৯৪৩) 'সুনীতিবাবু ও মুসলমান' নামের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ফজলুল হক হল ম্যাগাজিনে 'মুসলমানের সাহিত্য সাধনার অন্তরায়' রচনাটিও প্রকাশ পায়। সে সময় গল্প লেখায়ও আগ্রহ বোধ করেন তিনি। তাঁর প্রথম গল্পের নাম 'কয়েদীর গল্প', এটি *মাসিক মোহাম্মদীতে* (১৯৪৬) প্রকাশিত হয়। 'মকবুল' গল্পটি ছাপা হয় *দৈনিক আজাদ*-এর এক সংখ্যায়

(১৯৫০), আর 'সোয়ামীর ঘর' গল্পটির প্রকাশ ঘটে *মাসিক দিলরুবা* পত্রিকায় (১৯৫০)। 'শান্তির পথ' নামের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় *দৈনিক ইনসাফে* (১৯৫১)। প্রথম নকশা জাতীয় রচনা 'পিতৃঋণ' বের হয় *দৈনিক মিল্লাতের* ৩০ নভেম্বর ১৯৫২ রবিবাসরীয় সংখ্যায়। 'পুথি রচয়িতা' *নামের বেতার কথিকা, যা ২৫মে,* ১৯৫২তে সম্প্রচারিত হয়েছিল, রেডিওর মুখপত্র *এলানে* প্রকাশিত হয় ১৯৫৩-এর অক্টোবর সংখ্যায়। প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদ 'হুঞ্জাভেলী' *মাহে নও* পত্রিকার ১৯৫৪-র অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আর প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধ 'Poet Quazi Daulat' *পাকিস্তান অবজার্ভার* পত্রিকার ১৯৫২-এর ২০ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। আহমদ শরীফের সৃষ্টিশীল রচনার পরিচিতি এখানেই পরিসমাপ্ত নয়, পরে আরো বেশ কয়েকটি গল্প, নকশা, কবিতা, কথিকা, রম্যরচনা, অনুবাদ তিনি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় এবং সাহিত্য সাময়িকপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। আহমদ শরীফের এসব সৃষ্টিশীল রচনা কখনো গ্রন্থবদ্ধ হয়নি এবং এগুলো সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেও না। উত্তরকালে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিপুল পরিচর্যা ও রচনার ভারে গল্প কবিতা একেবারেই তলিয়ে গেছে।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকে আহমদ শরীফ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। সে আমলের প্রায় সকল বাংলা দৈনিক পত্রিকায় এবং সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। সেই পত্রিকাগুলোর মধ্যে *সংবাদ* ও *ইত্তেফাক* বাদ দিয়ে অন্য সবগুলোই এখন লুপ্ত। দৈনিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল *ইনসাফ, মিল্লাত, আজাদ, ইত্তেহাদ, জমানা* (চট্টগ্রাম), *পূর্বদেশ, গণকণ্ঠ* ইত্যাদি; সাহিত্য সাময়িকীর মধ্যে ছিল *সোনার বাংলা, নওবাহার, দিলরুবা, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও, কাফেলা, আলাপনী, স্পন্দন, পরিক্রম, উত্তরণ, পূবালী* ইত্যাদি। এই সব পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। এসব লেখার প্রায় সব কয়টি প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা আলোচনা জাতীয়। তখন সদ্য পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্মাদনা লেখকদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তবু এর মধ্যেও ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশ ও দেশের মানুষ নিয়ে ভাবনাচিন্তা থাকা চিন্তাশীল লেখকদের ক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক। আহমদ শরীফও লিখেছেন নানা বিষয়ে। বাংলা সাহিত্যের হেন প্রসঙ্গ বা বিষয় কিংবা কবি সাহিত্যিক নেই যাঁদের নিয়ে তিনি লেখেননি। মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য প্রসঙ্গ, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মদর্শনের স্বরূপ, বাংলার সমাজ সংস্কৃতি, সমাজ বিবর্তন এবং আধুনিক যুগের প্রায় সকল সুখ্যাত-স্বল্পখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্র, চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা ইত্যাকার বিষয় তাঁর প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। এসব লেখার অনেকগুলিই অবশ্য গুরুতর। এ-রকম গুরুতর প্রবন্ধের প্রথম গ্রন্থ হল *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮) যা আহমদ শরীফের বহুদিনের বহু রচনার সংকলন। *বিচিত চিন্তা* প্রাবন্ধিক হিসেবে আহমদ শরীফকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। এর পর প্রতিবছর নিয়মিতভাবে তাঁর প্রবন্ধের বই বের হতে থাকে, যেমন ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই—*সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* (১৯৭০) ইত্যাদি। *স্বদেশ অন্বেষা* গ্রন্থটির গুরুত্ব এইখানে যে, সত্তরের দশকে বাঙালি

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব উপলব্ধিতে ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষগুলোর নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও ধর্মীয় পরিচিতি, সামাজিক অভিপ্রায় ও রাজনৈতিক অন্বেষা এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রতিপাদ্য।

বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি ও গদ্যশিল্পীদের নিয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ। মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের পরিচিতি ও মূল্যায়নমূলক রচনা কিংবা কাব্যকাহিনীর পরিচিতি তিনিই ব্যাপকভাবে দিতে শুরু করেন পত্রপত্রিকায়। কবি মোহিতলাল মজুমদারকে নিয়ে তিনিই সম্ভবত বাংলাদেশে প্রথম মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ লেখেন (১৯৫২)। *একালে নজরুল* (১৯৯০) জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনা বিষয়ক বক্তৃতার গ্রন্থরূপ, কিন্তু আহমদ শরীফ তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রথম স্তর থেকেই নজরুলকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন এবং সেগুলোর কিছু ছড়িয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে, কিন্তু কেন সেগুলো আলাদাভাবে গ্রন্থরূপ নেয়নি তা একটা জিজ্ঞাসা বটে। তবে এটি ঠিক যে আহমদ শরীফ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু রচনা গ্রন্থভুক্ত করেননি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও একই কথা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ থাকলেও আলাদা গ্রন্থ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আহমদ শরীফকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে বিতর্কিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রবিরোধী বলতে যা বোঝায় আহমদ শরীফ কস্মিনকালেও তা নন। ষাটের দশকে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর কালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ চমৎকার প্রবন্ধ তিনিই লিখেছেন এবং এইসব প্রবন্ধে অসামান্য নান্দনিক ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানা বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "তাঁর স্বভাষী তাঁর কাছে পেয়েছে সৌন্দর্য দেখার চোখ, সুরুচির পাঠ, মানবতার বোধ ও বিশ্বজনীনতার দীক্ষা। তাঁর কাছে পেয়েছে তারা মুখের ভাষা, কণ্ঠের সুর, প্রাণের প্রীতি, চরিত্রের দার্ঢ্য। আত্মসম্মানবোধ, আনন্দের কাঙ্ক্ষা ও জীবনের প্রত্যয়। আজকের সংস্কৃতিবান মানবতাবাদী বাঙালী মাত্রই রবীন্দ্রনাথের মানবসন্তান।" (সৌন্দর্য বুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা/*বিচিত চিন্তা*)। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আর এক চরম উক্তি করেছেন তিনি এইভাবে—"বাঙলাদেশে দুইবার এক দেহে অসামান্য রূপগুণের সমাবেশ হয়েছিল। একবার চৈতন্যদেহে, অন্যবার রবীন্দ্র-শরীরে"। (*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড)। এ-রকম উক্তির পর আহমদ শরীফকে রবীন্দ্রবিরোধী বলার কী কোনো ভিত্তি আছে! টেলিভিশনের সেই বক্তব্যে আহমদ শরীফ গুরুবাদী রবীন্দ্রভক্তদের, বিশেষ করে সমাজবাদী বুদ্ধিজীবীদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রকে একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করেছে সে জন্য এখনকার বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ নন, সুকান্তই প্রেরণা। এরকম অভিমত থাকতেই পারে, হয়তো ডক্টর শরীফের কণ্ঠে চল্লিশের দশকের কম্যুনিস্টদের সুর বেজেছিল, কিন্তু যে তীব্রতায় তিনি কথাগুলো বলেছিলেন তাতে রবীন্দ্রভক্তরা খুব আহত হয়েছিলো। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে ডক্টর শরীফের মনোভঙ্গিকে খুব সমালোচনা করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এবং ডক্টর শরীফকে

রবীন্দ্রবিরোধী বলে ভুল বুঝেছিলেন। এ নিয়ে ঐ সময়ে অনেক তোলপাড় কাণ্ড ঘটেছিল, অনেক বাদানুবাদমূলক লেখাও বেরিয়েছিল, ডক্টর শরীফও লিখেছিলেন তাঁর অবস্থানের কথা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ প্রসঙ্গে আবার তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন—"ভক্তরা পীর-গুরু-নেতার কোন দোষ দেখে না। আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দোষে-গুণে মানুষ অথচ অনন্য অসাধারণ শক্তিধর কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করেছি মাত্র।" (প্রশ্নোত্তরে কিছু আত্মকথা—*জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*)। বোঝা যায়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর অনুভূতি গাঢ়, অন্যদিকে সমাজ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সমালোচক তিনি।

উনিশ শতকের সেরা বাঙালি সাহিত্যিক ও 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আহমদ শরীফের অনুরাগ বেজায় প্রবল। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম পড়িয়েছেন। পড়াশোনা ও বঙ্কিম অনুশীলনের সূত্রে দিনে দিনে এ অনুরাগ প্রবলতর হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনাদির গভীর পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগিতাবাদী ও শ্রেয়োবাদী সাহিত্যাদর্শ ডক্টর শরীফকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সেগুলো *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের *ভাষা ও সাহিত্যপত্রে* তাঁর 'বঙ্কিম-বীক্ষা : অন্য নিরিখে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে তাঁর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা। এই রচনায় তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যের অনুপম শিল্পকলা, বঙ্কিমের লোকচরিত্র বিশ্লেষণের অসামান্য দক্ষতা, বঙ্কিমের মানস বিবর্তনের চিত্র, বঙ্কিমের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের নিপুণ বীক্ষণ করেছেন। পরে বঙ্কিমকে নিয়ে আরো কিছু ছোট প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ সাম্প্রদায়িক বললে ডক্টর শরীফ ভারী অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁর দৃষ্টিতে ও বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো মুসলিমবিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক নন, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী মাত্র। তিনি আফসোস করেছেন এই বলে যে এত বড় শিল্পীর তো সমুদ্রে স্নান করার কথা, কেন তিনি ক্ষুদ্র জলাশয়ে অবগাহনে গেলেন! বলতেই হবে, বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চার প্রধান পুরুষ হলেন ডক্টর আহমদ শরীফ।

উনিশ-বিশ শতকের অন্যান্য প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিক যেমন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কায়কোবাদ, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহিতলাল মজুমদার, শাহাদাৎ হোসেন, বিভূতিভূষণ এবং আরো অনেকের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফের বহু প্রবন্ধ রয়েছে। দেখা যায়, তাঁর প্রবন্ধ-চিন্তা ক্রমশ সাহিত্যের তত্ত্ব, সৌন্দর্য ও ইতিহাস বিশ্লেষণের এলাকা অতিক্রম করে দেশ ও সমাজের সমস্যা ও সংকট কিংবা সমকালীন চালচিত্র উন্মোচনে অধিক প্রবণতা দেখিয়েছে। ডক্টর আহমদ শরীফ সমাজতান্ত্রিক শ্রেয়োবাদী চিন্তার লোক। গণমানবের কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর কাম্য। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় নানা সমস্যা ও সংকট উদ্ভূত হওয়ার জন্য তিনি গণবিরোধী দেশি বিদেশি অশুভ চক্রকেই দায়ী করেছেন এবং এইসব নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তীব্র ভাষায়–কখনো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে, কখনো দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামে। তিনিও খ্যাতিমান

কলামিস্ট, চলমান দেশজ রাজনীতি ও অর্থনীতির কড়া সমালোচক। আশির দশকে *পদধ্বনি* ও *নয়াপদধ্বনি* নামে বাম ধারার পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। আর শেষের জীবনে আমৃত্যু লিখেছেন দৈনিক *আজকের কাগজ* ও সাপ্তাহিক *খবরের কাগজ* পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে। একেবারে মৃত্যুকালীন সময়েও লিখেছেন তিনি। সুতরাং লেখক হিসেবে তিনি আমৃত্যু সক্রিয় ছিলেন। নিয়মিত লিখতে হত বলে ডক্টর শরীফ তাঁর কলাম লেখাগুলো পরিমার্জনাও করতে সময় পেতেন না। ডক্টর আহমদ শরীফের মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশোর্ধ্ব। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল *যুগযন্ত্রণা* (১৩৭৪), *কালিক ভাবনা* (১৯৭৪), *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (১৯৭৯), *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫), *ইদানীং আমরা* (১৯৮৬), *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা* (১৯৮৭), *বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র* (১৯৯০), *মানবতা ও গণমুক্তি* (১৯৯০), *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব* (১৯৯২), *সংস্কৃতি* (১৯৯২), *প্রগতির বাধা ও পন্থা* (১৯৯৪), *সময়, সমাজ, মানুষ* (১৯৯৫), *স্বদেশ চিন্তা* (১৯৯৭), *মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ* (১৯৯৮), *বিশ শতকে বাঙালী* (১৯৯৮) ইত্যাদি। এসব গ্রন্থের ভাববস্তু পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষ ডক্টর আহমদ শরীফের প্রবন্ধ-চিন্তার উপজীব্য।

মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণা

ডক্টর আহমদ শরীফের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণা। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিগুলোর সিংহভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়েছিল এবং সেই পুথিগুলোর সূত্রেই আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগ দেন। পুথি পাঠ ও পুথির সম্পাদনা রীতি তিনি পূর্ব থেকেই একটু একটু জানতেন, যেহেতু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাহচর্যে তিনি এসবের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু পুথিকে ধ্যানজ্ঞান করে পরম ভালোবাসাসহ সেগুলোকে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গভীর গবেষণার কাজ তিনি শুরু করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার পর থেকে। বৈকালিক আড্ডা ছাড়া তিনি আর কিছুতেই সময় নষ্ট করেননি; তাসপাশা খেলেননি, বেড়িয়ে বা সিনেমা দেখে সময় অপচয় করেননি। দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জীবনের প্রথম পর্যায়ে পুথিই তাঁর প্রাত্যহিক ভাবনার বিষয় ছিল। পুরোনো পুথির পাঠোদ্ধার মোটেও সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে লিপিবিদ্যার পারদর্শিতাই যথেষ্ট নয়, শব্দের শনাক্তি ও সঠিক অর্থ নির্ণয় এবং অন্যান্য পরিচিতি দান ও ব্যাখ্যা, টীকা-ভাষ্য রচনা করাও জরুরি কাজ। এ কারণে তাঁকে সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এই কাজে আহমদ শরীফ যে ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণ মিলল অল্প দিনে। পুথি বিষয়ক গুরুতর গবেষণা নিবন্ধাবলি রচনা করতে থাকলেন তিনি এবং সেগুলো *সাহিত্য পত্রিকা* ও *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা* এই দুটি অতি সুখ্যাত গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। পুথিগুলো নিয়ে তিনি একটু সহজভাবে

আলোচনা করলেন দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় কিংবা সাময়িক পত্রিকায়। এইভাবে পুথি সম্পাদনা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কালক্রমে এই খ্যাতি বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণায় প্রসিদ্ধি হিসেবে রূপ নেয়।

আহমদ শরীফের প্রথম প্রকাশিত সম্পাদিত পুথি হল ষোড়শ শতাব্দীর কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* কাব্য (১৯৫৭)। এটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। প্রত্যাশিতভাবে এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে। উৎসর্গপত্রে বলেছেন, "আপনার সাধনা-সুন্দর-জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল।" উল্লেখ্য যে আহমদ শরীফের প্রথম গ্রন্থ লায়লী-মজনু বাংলা একাডেমীরও প্রথম গ্রন্থ। সুতরাং এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত পুথিগুলোর পরিচায়িকা *পুথি পরিচিতি* (১৯৫৮) আহমদ শরীফের দ্বিতীয় গ্রন্থ। মধ্যযুগের পুথি গবেষকদের জন্য এটি একটি অমূল্য সহায়ক গ্রন্থ। প্রায় ছয় শ পুথির পরিচায়িকা এই পুস্তকে আছে। এই গ্রন্থটির প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং উল্লেখ্য যে, এটি বাংলা বিভাগেরও প্রথম গ্রন্থ। পঞ্চাশের দশকে সেই যে পুথি সম্পাদনার কাজ শুরু করেছিলেন আহমদ শরীফ তার বিরতি ঘটেনি আমৃত্যু। একে একে তাঁর সম্পাদিত অসংখ্য পুথি প্রকাশিত হতে থাকল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউলের *তোহফা* (১৯৫৮) ও *সিকান্দারনামা* (১৯৭৭), মুহম্মদ খানের *সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ* (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* (১৯৫৯), জয়েনউদ্দীনের *রসুল বিজয়* (১৯৬৪), মুজাম্মিলের *নীতি শাস্ত্র বার্তা* (১৯৬৫), *শাবারিদ খানের গ্রন্থাবলী* (১৯৬৬), কোরেশী মাগন ঠাকুরের *চন্দ্রাবতী* (১৯৬৭), আফজল আলীর *নসিহতনামা* (১৯৬৯), দোনা গাজীর *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* (১৯৭৫), সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* (১৯৭৮) ও *রসুলচরিত* (১৯৭৮), শেখ মুতালিবের *কিফায়তুল মুসল্লিন* (১৯৭৮) ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রকাশ করলেন *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* (১৯৬১), *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ* (১৯৬২), *পুথির ফসল* (১৯৬৬), *মধ্যযুগের রাগতাল নামা* (১৯৬৭), *বাঙলার সূফী সাহিত্য* (১৯৬৯), *হিন্দু কবির পদ সাহিত্য* (১৯৭৩), *সওয়াল সাহিত্য* (১৯৭৬) এবং আরো বহু পুথি। আহমদ শরীফের সম্পাদিত পুথির সংখ্যাও চল্লিশোর্ধ্ব।

আহমদ শরীফের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ফসল, পুথি সম্পাদনা ও পুথি বিষয়ক আলোচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণার অতি নির্ভরশীল উপাদান। এটি মানতে হবে যে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত উপাত্ত আহমদ শরীফের যোগ্য সম্পাদনায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের অতীব আগ্রহের বিষয় হয়েছে। সুকুমার সেন, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং আরো অনেকের সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থ আহমদ শরীফের গবেষণায় সহায়তা পেয়েছে। আহমদ শরীফও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন সৈয়দ সুলতানের কাল বিশ্লেষণ ও রচনাকর্ম

সম্পাদনা করে। আহমদ শরীফ এমনিতেই মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, তদুপরি সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়েছেন। স্বভাবতই তাঁর ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা তাঁর কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিহাস প্রত্যাশা করছিলেন। ডক্টর শরীফ তাঁদের সে প্রত্যাশা পূরণ করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে। তবে বাংলা সাহিত্যের পুরো ইতিহাস নয়, কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এর আগে *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থে 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়া চিত্র' শিরোনামায় একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাকৃতির আলোচনায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে। এই রচনাটিই সামান্য সংযোজনসহ *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য* নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৮৫)। এটি মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষজ্ঞ আহমদ শরীফের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। সীমিত পরিসরে সুমিত ভাষায় সকল তথ্যে, বিবরণে ও বিশ্লেষণে ইতিহাসের ধারাক্রমিক পর্যালোচনা এই রচনার বৈশিষ্ট্য। কোথাও বাহুল্য নেই, অতিকথন নেই, ঠিক ঠিক যা বলার অবিকল তাই বিবৃত হয়েছে এখানে। এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন সংযমী রচনা ডক্টর শরীফ বেশি লেখেননি। পরবর্তী সময়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত রচনা *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩) এই রচনারই সম্প্রসারিত রূপ। নিঃসন্দেহে বলা যাবে *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* ডক্টর আহমদ শরীফের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনন্য। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর অসাম্প্রদায়িক রূপ–হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহিত্য সাধনার পরিচয়ই তিনি দিয়েছেন। সুকুমার সেনের মতো আলাদা করে তাঁকে *ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য* লিখতে হয়নি। তিনি তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বিপুল পুথি সংগ্রহ কাজে লাগিয়ে এটি প্রমাণ করলেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহিত্য। প্রচলিত সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বাংলার মুসলমানের কথা তেমন বর্ণিত হয়নি, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য রস মেটানোর এত আয়োজন যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়েছিল তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অনলস সাধনা ছাড়া জানার ও বোঝার উপায় ছিল না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের আবিষ্কারের মতোই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আবিষ্কার রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনের অমূল্য সহায়ক। পিতৃব্যের সংগৃহীত সম্পদের সাহায্যে ডক্টর আহমদ শরীফ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হলেন। পুথিগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে, সেগুলোর সাহিত্য গুণ, রস নিষ্পত্তি, সমাজসূত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ইতিহাসের ক্রমবিকশিত ধারায় সেগুলো চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করেছেন। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পূর্ণতা এল। বলতে দ্বিধা নেই, আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* মধ্যযুগের সাহিত্যের সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ।

বইটির শিরোনামা অনুধাবনযোগ্য। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই নিঃসন্দেহে বাঙালি। এই সব বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাসের নাম *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* হওয়াই সমীচীন। এই ইতিহাস গ্রন্থ বাঙালী মুসলমানের হীনমন্যতাবোধেরও অবসান ঘটিয়েছে। এই ইতিহাসগ্রন্থ বর্ণনামূলক নয়,

বিশ্লেষণাত্মক। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিচার সূত্রে বাঙালির সাহিত্য-ইতিহাস এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। ধর্মদেশনার, চিন্তা-চেতনার, বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও মিলনের অগ্রসরমানতায় একটি নরগোষ্ঠীর ভাব ও রসের জগৎ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে সেটাই আহমদ শরীফ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ তত্ত্ব, চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল সাহিত্য এবং বলা বাহুল্য মুসলমান রচিত প্রণয়োপাখ্যান, শাস্ত্র ও তত্ত্ব বিষয়ক রচনা, সুফী সাহিত্য, দোভাষী রীতির সাহিত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে ডক্টর শরীফ মৌলিক বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করতে পেরেছেন। সাহিত্যের ও সমাজের ইতিহাসমূলক রচনাসমূহ, উল্লেখযোগ্য পুথি সম্পাদনা ও আলোচনা ডক্টর আহমদ শরীফকে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শীর্ষ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মর্যাদা দিয়েছে এবং তিনি সেইভাবে খ্যাতি ও মর্যাদা পেয়েছেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মৃত্যুর (১৯৯০) পর ডক্টর আহমদ শরীফই ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত।

ডক্টর আহমদ শরীফের রচনার আরেকটি প্রান্তের কথা অবশ্য উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল তাঁর রচিত ও সম্পাদিত পাঠ্যগ্রন্থসমূহ, যার কোনোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনোটি কলেজে পাঠ্য হিসেবে গৃহীত। এই সূত্রে স্মর্তব্য, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* সংকলন গ্রন্থটি, যা মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। আবদুল হাইয়ের নাম থাকলেও এ সম্পাদিত গ্রন্থটির ভূমিকা এবং রচনাংশ নির্বাচন সবই আহমদ শরীফের কীর্তি। এ গ্রন্থের মুখ্য অংশ বৈষ্ণবপদাবলী, গৌণ অংশ বাউল পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী। পদাবলীর এটি একটি উৎকৃষ্ট সংকলন এবং পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবেও এটি আদর্শ স্থানীয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটি পাঠ্যগ্রন্থ। বলা বাহুল্য, পদাবলী সংকলন হিসেবে বাংলাদেশে এটি এখন পর্যন্ত একমাত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী বাংলা সংকলন, রচনা গ্রন্থ, ব্যাকরণ, গল্প সংকলন ইত্যাদি রচনা করেছিলেন এবং এগুলো যথারীতি পাঠ্যপুস্তকবোর্ড ও শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে শিক্ষায়তনে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু ছিল।

সামাজিক ভূমিকা

ডক্টর আহমদ শরীফ বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী নামের মধ্যে যে অনপনেয় চারিত্র দার্ঢ্য ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গসূত্র নিহিত রয়েছে তার সবটাই ডক্টর শরীফের ক্ষেত্রে বর্তায়। বাংলাদেশের সমাজ-রাজনৈতিক সংস্কৃতি বুদ্ধিজীবীর অবস্থানকে টলমল করার জন্য যথেষ্ট। মাথার ঠিক থাকে না অনেকের। চারদিকে হাতছানি—লোভের, পদের, ক্ষমতার, সুবিধাবাদের এবং আরো কত কত বাসনার। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও লোভী রাজনৈতিক ক্ষমতা-আকাঙ্ক্ষী মানুষের মতো ঘন ঘন মত বদলায়, পথ বদলায়; তারা কখনো প্রগতিশীল, কখনো

প্রতিক্রিয়াশীল, কখনো গণমানবের পক্ষে, কখনো বিপক্ষে; প্রকাশ্যে স্বৈরাচারবিরোধী, গোপনে স্বৈরাচারের পদলেহী, কখনো নাস্তিক, কখনো আস্তিক, কখনো কম্যুনিস্ট, কখনো ক্যাপিটালিস্ট। কেউ ভিতরে শুভবাদী, আলাপ-আলোচনায় ন্যায়ের পক্ষে, বাস্তবে বড় ভীরু, বরং সুবিধামতো আপসকামী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দোলাচলবৃত্তি দেখা দিতে শুরু করে, স্বাধীন বাংলাদেশে সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রভ্রষ্টতার পথ সুগম হয়ে যায়। কোনো আদর্শবাদের জন্য নয়, তাদের এই বৈপরীত্যমূলক আচরণের মূল ক্ষুদ্রবৃহৎ স্বার্থচিন্তা। নিজের স্বার্থ নিজে দেখবে, তাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি অনৈতিক হলে যত আপত্তি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক ভিত্তি মোটেও সুদৃঢ় নয়। বছর পনেরো বিশেক আগেও আদর্শবাদের কথা বলা যেত, কিন্তু দিন যতই গড়াচ্ছে, বুদ্ধিজীবী শব্দটিও মর্যাদা হারাচ্ছে এবং এর মধ্যে অনেকটা হারিয়েও বসেছে। এই ডামাডোলের ভিতর বসবাস করেছেন আহমদ শরীফ, কিন্তু আশ্চর্য বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কখনো চরিত্র হারাননি তিনি। ছলনা করেননি কখনো, নিজের বিশ্বাসের ও অবস্থানেরও পরিবর্তন করেননি। ডক্টর শরীফও জাগতিক চেতনার মানুষ, তাঁরও নিশ্চয়ই বাসনা কামনা রয়েছে, তাঁরও লোককাম্য পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সামান্য অবস্থান বিচ্যুত হলে তিনি এসব পেতে পারতেন। কিন্তু যা গণতান্ত্রিক নয়, যা ন্যায় ও নিয়মাধীন নয়, কেবল সুবিধাবাদ বা আপসকামিতা তার বিরুদ্ধেই তিনি নিয়েছিলেন দৃঢ় অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে করতে বিভিন্ন প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংঘ-সমিতি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই যে সামাজিক আধিব্যাধির বিরুদ্ধে সাহসভরা কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন আর শক্ত কলমে লিখতে শুরু করলেন তা থেকে বিরত হননি কখনো। মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষকের এ এক অপূর্ব রূপান্তর। শুধু পুথির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তো চলবে না বা 'মূর্তিমান মধ্যযুগ'রূপে অন্যের অবজ্ঞা ও নাক-সিটকানো ভাবের লক্ষ্য হওয়াও কোনো কাজের কথা নয়। যেন মধ্যযুগের পুথি সম্পাদনা মানেই চিন্তা-চেতনায়ও মধ্যযুগীয়, যেন সে ব্যক্তির কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, নেই আধুনিক মন, নেই কোনো প্রগতিশীলতা। তাঁর সম্পর্কে কতিপয় মানুষের এই রকম ধারণা নিয়ে আহমদ শরীফ উত্তরকালে বিপুল কৌতুক অনুভব করতেন।

মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণা আহমদ শরীফের চিন্তা-চেতনা বিকাশে খুব ইতিবাচক ফল দিয়েছিল। এই গবেষণা দেশ, জাতি, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধারণাকে আরো স্বচ্ছ ও প্রীতিময় করে, বাঙালি জাতি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিচার-বিশ্লেষণে জানার ও বোঝার পথ করে দেয় এবং বাঙালির জাতিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান সৃষ্টি করে। ষাটের দশকের শেষ দিকে আহমদ শরীফ এসব নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লেখাও লিখেছিলেন। বাঙলা ও বাঙালিত্ব চর্চার সঙ্গে তাঁর গণমানব হিতৈষণা, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, বাম ঘেঁষা রাজনৈতিক চিন্তা এবং গভীর দেশদেশনা তাকে সম্মানিত বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা ও খ্যাতি দেয়। এবং তখন থেকেই তিনি বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ষাটের দশক থেকে আরম্ভ করে আমৃত্যু বিবেকী

বুদ্ধিজীবী হিসেবে আহমদ শরীফের বিশিষ্ট পরিচয় অক্ষুণ্ন তো ছিলই, বরং দিনে দিনে এ পরিচয়ের মহিমা ব্যাপ্ত হয়েছে। নানা সময়ে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৩-তে ছাত্রনেতা আবদুল আজিজ বাগমারের উদ্যোগে গঠিত অপূর্ব সংসদের অর্থাৎ গোপন সংগঠন অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের ইস্তেহার তিনিই রচনা করেছিলেন। ১৯৬৮তে আইউবী উন্নয়ন দশকের মহোৎসবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সিকান্দার আবু জাফর ও হাসান হাফিজুর রহমানকে নিয়ে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মহাকবি স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উনিশ শ ঊনসত্তর-সত্তরে ডক্টর শরীফের বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। ১৯৭১ -এর ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে বাঙালি জাতির অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী লেখক-শিল্পীরা সবাই মিলে লেখক সংগ্রাম শিবির গঠন করেন এবং সভাপতি হন ডক্টর আহমদ শরীফ। তাঁরই নেতৃত্বে ৫ মার্চ লেখক-শিল্পীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করেন। ২৩ মার্চ বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে লেখক সংগ্রাম শিবির আয়োজিত এক সভায় ডক্টর আহমদ শরীফ 'ভবিষ্যতের বাঙালী' নামে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ডক্টর আহমদ শরীফের সামাজিক দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এই সময় বুদ্ধিজীবীর সাহসী মর্যাদা সমুন্নত রাখেন তিনি। নানা সংঘ ও সমিতির সভাপতি, আহবায়ক বা সদস্য হিসেবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। কখনো তিনি বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি, কখনো ভাষা সমিতির সভাপতি, কখনো মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি বা মন্বন্তর প্রতিরোধ কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য। আরো অসংখ্য মানববাদী সংঘের উপদেষ্টা বা আহবায়ক, বামপন্থী দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যায়ী। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রাজনীতিতে যখনই গণবিরোধী কালাকানুন প্রবর্তিত হয়েছে তখনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন দুরন্ত সাহসে। লড়েছেন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সেনাশাসন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, দেশি-বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। শেষ জীবনে 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ'-এর কার্যক্রম নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমৃত্যু এই সংঘেরই সভাপতি ছিলেন তিনি।

স্বভাববৈশিষ্ট্য আচারআচরণ ও জীবনযাপনরীতি

ডক্টর আহমদ শরীফ স্বাধীনচেতনা মানুষ ছিলেন। খুব দীর্ঘকায় নন তিনি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ছিল প্রদীপ্ত, পুরুষালি। তাঁর জেদ গোঁ ও অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবের কথা সুবিদিত। কাউকে তোয়াজ করে, তোষামোদ বা স্তাবকতার সুরে কথা বলেননি তিনি কখনো। সব সময় ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ও উন্নতশির ছিলেন। বিনয়ী প্রিয়ভাষী তিনি নন। কাউকে উচিত কথা স্পষ্টভাবে বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না, সে ব্যক্তি যতবড় ক্ষমতাধর হোক না কেন। এ কারণে অনেকে তাঁকে ভয় করত, তাঁর উপর বিরক্ত হত,

অনেকে আবার তাঁকে পছন্দ করত। শিক্ষার্থী ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁর সম্পর্কে তাদের ভয়ভীতি যেমন ছিল, তেমনি ভক্তিপ্রীতিও ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন বলে তিনি হয়তো কিছুটা মেজাজী, বিশেষ পরিস্থিতিতে সে মেজাজের প্রকাশও ঘটত। কিন্তু সকল আচার-আচরণ এবং মানবিক সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ অসূয়ামুক্ত। নিঃসন্দেহে তিনি জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তরুণেরা তাঁর প্রতি সব সময় আকর্ষণ বোধ করেছে। এটা এজন্য যে তিনি সবসময় নতুন করে কথা বলতে চাইতেন, যুগ পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানাতেন, আর তারুণ্যের প্রশংসা করতেন। 'বেয়াদপি জিন্দাবাদ' নামে শরীফ সাহেবের একটি প্রবন্ধ আছে। সুশীল সমাজ প্রবন্ধটির শিরোনাম নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু শরীফ সাহেব সেই বেয়াদপিকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন যা রক্ষণশীলতা ও অবিজ্ঞানকে দূর করতে ঔদ্ধত্য দেখাবে, প্রথাগত পশ্চাৎপদ রীতিনীতির মূল উপড়ে ফেলতে সাহস দেখাবে। ক্লাসে পড়ানো, লেখালেখি ও বক্তৃতার বাইরে ডক্টর আহমদ শরীফের সময় কাটত আড্ডাতে। আড্ডা ডক্টর শরীফের প্রিয় ব্যসন এবং সুদীর্ঘকাল এই আড্ডা নিয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি কোনোদিন ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না, কখনো সখনো তাসপাশা খেলেছেন কি না সন্দেহ। তিনি কখনো স্টেডিয়ামে যাননি, রেডিওতে ধারাভাষ্য শোনেননি, টেলিভিশনে ক্রিকেট-ফুটবল দেখার আগ্রহ বোধ করেননি। কিন্তু আড্ডাতে আনন্দ পেতেন বেজায়। সমবয়সী সমমনা ও আগ্রহী তরুণেরা তাঁর আড্ডার সদস্য। অধ্যাপনার প্রথম জীবনে আর্মানিটোলার বাসায় যখন ছিলেন তখন থেকেই আড্ডার সূত্রপাত। পরে সেটি ফুলার রোডের বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে একটি গুঁড়িতে বসে আড্ডা হতো বলে এর নাম গুঁড়ির আড্ডা। তিনিই ছিলেন গুঁড়ির আড্ডার অলিখিত প্রেসিডেন্ট। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর যেখানে যেখানে তিনি বাসা করেছেন সেখানে সেখানে তাঁর আড্ডাও গেছে। শেষে ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসার বৈঠকখানায় এই আড্ডা স্থিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াতেন তখন দ্বিপ্রাহরিক আড্ডা সারতেন কলাভবনের লাউঞ্জে। তখন তাঁকে ঘিরে লাউঞ্জের একটা কোণ ভরে উঠত। অবসর জীবনে তাঁর বাসার বৈঠকখানাই ছিল আড্ডাস্থল। প্রতি শুক্রবারে একদল তরুণ তাঁর বৈঠকখানায় আসত। অন্যদিন বৈকালিক ভ্রমণের পর তিনি বসতেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গোলচত্বরে। আড্ডার আসর তাঁর বৈঠকখানাতে হোক বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হোক, তিনিই ছিলেন আসরের মধ্যমণি। সাধারণত তিনি একাই কথা বলতেন, অন্যেরা শুনত, প্রশ্ন করত। এইভাবে আড্ডা জমে উঠত তুঙ্গে। আড্ডার বিষয় দৈনন্দিন হালচাল, দেশদুনিয়ার খবর, রাজনীতির কূটচাল, অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অবশ্যই সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি। লঘুগুরু সব আলোচনাই এখানে হত এবং সব আলোচনাই ছিল প্রাণবন্ত ও সরস।

ডক্টর আহমদ শরীফ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন ১৯৬৬-র দিকে। ডাক্তারের পরামর্শে তখন থেকে দৈনিক এক-দুই ঘন্টা হাঁটা ছিল তাঁর ব্যায়াম, আমৃত্যু তিনি হেঁটেছেন। তাঁর শরীর সক্ষম ছিল, তিনি হাঁটতে পারতেন প্রচুর এবং সেটা কালক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

একসময় ধূমপানে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। সিগারেট খেতেন ঘন ঘন, যাকে বলে চেইন স্মোকার, তিনি তাই ছিলেন। তবে ঘরে সাধারণত তিনি হুঁকো খেতেন। এই বিলীয়মান সামন্ত বিলাস তিনি বজায় রেখেছিলেন বহুদিন। বাহারি ফরাসে নল লাগিয়ে মনের সুখে তিনি টানতেন। একদিন পট করে ধূমপানও ছেড়ে দিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর বছর দশেক আগের ঘটনা।

কাপড়-চোপড়ে ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন আধুনিক। তবে তাঁর পোশাক-আশাক ছিল সরল। আটপৌরে ঘরোয়া পরিবেশে তিনি থাকতেন শ্বেতশুভ্র পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। গ্রীষ্মের পোশাক ছিল প্যান্ট আর ফুলহাতা শার্ট, কিন্তু শীতকালে অবশ্যই পরতেন স্যুট-টাই। ডক্টর শরীফ সব সময় বলতেন ভাষা হিসেবে ইংরেজি আর পোষাক হিসেবে স্যুট-টাই টিকে থাকবে।

ডক্টর আহমদ শরীফ দীর্ঘদিন বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। এই রোগ তাঁর মৃত্যুপর্যন্ত সঙ্গী ছিল। অনিয়ন্ত্রিত ছিল না, কিন্তু ডক্টর শরীফকে ইনসুলিন নিতে হত। এই অসুখে তাঁর হৃদরোগের আশঙ্কা বেড়ে যায় এবং তাঁর কিডনির সমস্যা হতে থাকে। শেষ জীবনে এই সব নিয়ে মাঝেমধ্যে ভুগেছেন। একবার হার্টের অসুখের কারণে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালেও ছিলেন। তবে জীবন যে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছিল এটি তিনি উপলব্ধি করছিলেন। দীর্ঘ জীবনে কাজ কমে করেননি এবং দায়িত্বও কম পালন করেননি। তবে আগাগোড়াই তিনি জীবনবাদী ছিলেন। জীবনের পরে কী আছে তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তাই তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করেনি। সে জন্য অকুতোভয়ে মরে যেতে পারলেন। নিজের মরদেহ নিয়ে আগেই অসিয়ৎনামা করে গেছেন এই মর্মে যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণের কাজে লাগাবে, চোখ দুটো নেবে সন্ধানী, আর তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মীয় কৃত্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

১৯৯৮-এর অক্টোবর নভেম্বরে তাঁর বুকে বেজায় ঠাণ্ডা লাগে এবং এ অসুখ সারতে বেশ সময়ও লাগে। ততদিনে তাঁর দেহ অনেকটা জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি প্রয়াত হবেন কেউ ভাবেনি। ১৯৯৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিতে নিতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এভাবে বাংলাদেশের জ্ঞান মনীষা ও পাণ্ডিত্যের এবং সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের এক মহান মানবতাবাদী ও গণদরদী পুরুষের জীবনাবসান ঘটল।

[এ প্রবন্ধটি আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ *(মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার সম্পাদিত, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০১) থেকে পুনর্মুদ্রিত]*